মূল্যায়ন

"বোস এইখানে, এই নিঃশ্বাসের কাছে
হৃদয়ের থেকে ভালো বাসভূমি নেই।।"

(কবিতা সংগ্রহ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৫৬)

মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনের প্রায় ৪২-৪৩ বছর ধরে বাংলা নাটক রচনায় ধ্যানস্থ ছিলেন। জীবনের শ্রম, সময়, মেধা, মনন, বুদ্ধি, কবিত্ব, শিল্প-প্রতিভা ঢেলে দিয়েছিলেন রিয়ালিজমের বিপরীতে ননরিয়ালিস্ট ধারার নাটককে বাংলা থিয়েটারে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বাস্তব বিরোধী ধারার নাটকের অভাব থেকে তিনি বাংলা নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সমস্ত জীবনে তিনি পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্ক, কাব্যনাটক, অণুনাটক মিলিয়ে প্রায় একশোটিরও বেশি নাটক লিখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলায় একটি নতুন নাট্যদর্শন, নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু প্রথম দিকে তাঁর চলার পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলো সম্পর্কে তিনি নানা সমালোচনা বাণে বিদ্ধ হয়েছিলেন। উদ্ভট, অর্থহীন, সমাজবিচ্ছিন্ন, খামখেয়ালিপনা, অবাস্তব বলে অনেকেই তাঁর নাটককে উড়িয়ে দিয়েছিল। নিত্যপ্রিয় ঘোষ নামে একজন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পবিত্র সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত একটা পাক্ষিক নাট্যপত্রে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকটির সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকটি মঞ্চস্থ হলে দর্শকদের ঢিল মেরে বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি। আরেকবার শিবপুরের একটি কলেজে শ্রী শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় 'নক্ষত্র' নাট্যসংস্থা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকটি মঞ্চস্থ করলে সেখানে একরকম অঘটন ঘটেছিল। দর্শকেরা নাটক চলাকালীন প্রথমে কটূক্তি ও বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল, পরে তারা মারমুখী হয়ে ওঠে। নাট্যকার, নির্দেশক ও অন্যান্যরা প্রাণভয়ে বাসে করে পালিয়ে আসছিল, আর উত্তেজিত দর্শকরা তাদের বাস লক্ষ করে ইঁট ছুড়ছিল। কেননা দর্শকদের কাছে নাটকটি নাকি অত্যন্ত দুর্বোধ্য ঠেকেছিল।

শুরুর দিনগুলি ছিল এইরকমই। প্রথমের দিকে তাঁর একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। তিনি নিজে নাটক নির্দেশনা করতেন না এবং তাঁর নিজস্ব কোন নাট্যদল না থাকায় নাটক নির্দেশনা ও মঞ্চস্থ হওয়ার জন্য অন্য নির্দেশক ও দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত তাঁকে। বাংলা থিয়েটারে সমসময়ে যা আর কোন নাট্যকারের নাটক নির্দেশনায় এই সমস্যা ছিল না। এই দিক থেকে তিনি ছিলেন বাংলা থিয়েটারে একজন ব্যতিক্রমী নাট্যকার। অন্যদিকে অন্য নাট্যকাররা যেহেতু বাস্তবধর্মী নাটক নির্দেশনাতেই অভ্যস্থ ছিলেন এবং দর্শকরাও সেই ধরনের নাটক দেখতে অভ্যস্থ ছিল, তাই প্রথমে কোন নির্দেশকই তাঁর ননরিয়ালিস্টিক ধারার নাটক নির্দেশনা বা মঞ্চস্থ করার দুঃসাহস দেখাননি। কিন্তু ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। অসামান্য জেদ আর ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষায় থাকতেন তিনি। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, একদিন তাঁর নাটক নির্দেশনার প্রয়োজন অনুভব করবেই নির্দেশকেরা। তাই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে ননরিয়ালিস্টিক ধারার নাটক লিখতে পেরেছিলেন তিনি— পেয়েছিলেন

সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা।

যদিও তাঁর নাটক তিনি নিজে নির্দেশনা না করায় নিজের ইচ্ছা, ভঙ্গি ও চেষ্টা অনুযায়ী নাটক নির্দেশনা হয়নি বলে তাঁর মধ্যে একটা অতৃপ্তি, একটা সংকট নাটক লিখতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছেন—

> ‘এখানে নাটকের চর্চা, প্রয়োগ-ভাবনা, দর্শক সমাজের অভ্যস্ততা, সবই প্রধানত বাস্তবধর্মী নাটককে ঘিরে। তাই যাঁরাই আমার নাটক পরিচালনা করেছেন তাঁরা বাস্তবধর্মী নাট্য-প্রয়োগের অভ্যাস, দীক্ষা এবং সংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেননি। পারার কথাও নয়। একাজে নাট্যকারের সমধর্মী non-realist art form-অনুপ্রাণিত নাট্যনির্দেশকের প্রয়োজন। সে পরিবেশ এবং পরিজন এখানে অনেকটা বিরল। তবু নিজেদের সংস্কার এবং অভ্যস্ত প্রয়োগ-প্রণালী থেকে সরে এসে কিছু নির্দেশক আমার নাটক যে মঞ্চস্থ করেছেন তার জন্যই আমি নাটক লেখা থেকে বিদায় নিইনি। তাঁরা অনেকেই সম্মানিত কাজও করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের মনন, থিয়েটার-ভাবনা, প্রয়োগ কল্পনা যথেষ্ট উন্নত বলেই non-realistic নাটক নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পারেন। আমার নাটকের ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গে শ্রী শ্যামল ঘোষ, শ্রী বিভাস চক্রবর্তী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা আমাকে লিখে বলবার শক্তি জুগিয়েছেন।’[১]

তিনি নিজে অনায়াসেই নাটক নির্দেশনা করতে পারতেন। অনেকেই তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন একটা অন্তত নাটক যেন তিনি নির্দেশনা করেন। অনেকেই তাকে বলেছিলেন সমস্ত কিছু তারা রেডি করে দেবেন তিনি শুধু নাটকটা পরিচালনা করবেন। ফ্লপ হলেও তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হননি। তিনি সেই কাজেই হাত দেন যে কাজটা তিনি একশো ভাগ নিজের মনে করেন। কবিতা লিখতে লিখতে একজন প্রধান কবি হয়ে ওঠেও তিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেননা কবিতাতে তিনি নিজের লক্ষ্য, পথ, নিজস্বতা কোনটাই নাকি পাননি। ঠিক তেমনি নাটক নির্দেশনার কাজটাও তিনি নিজের বলে কখনো মন থেকে ভাবতে পারেননি। সম্পূর্ণ নিজের না হলে তিনি কোন শিল্পকর্মেই মন বসাতে রাজি ছিলেন না। যদি নির্দেশনাটা নিজের বোধের প্রকাশ বলে মনে করতেন; তবে সর্বস্ব দিয়েই তিনি সেটা করতেন। তাই তিনি নিজস্ব নির্দেশনার স্টাইল তৈরি করতে পারেননি। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে নির্দেশনার কিছু কিছু জিনিস ভেবেছিলেন। অভিনয়, প্রয়োগ, সংগীত নিয়েও ভেবেছিলেন। বিচ্ছিন্নভাবে ভাবা অংশগুলো তিনি কখনো সমগ্র রূপ দান করতে পারেননি। ননরিয়ালিস্টিক নাটক নিয়েও তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু কখনো তিনি তা সম্পন্ন করেননি। তিনি আশঙ্কিত ছিলেন যে, হয়তো সেগুলো কখনো কেউ মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করবে না। তা করার মতো পরিবেশও তখন ছিল না, এমন নাটক আপন করে নেওয়ার জন্য। যেহেতু নাটকের সার্থকতা মঞ্চে, নির্দেশনায়, অভিনয়ে— তাই সমস্ত নাটক লিখলেও তা মঞ্চস্থ না হলে তার আর কোন মূল্য থাকবে না। যে নাটকগুলো শুরুর দিকে তিনি লিখেছিলেন সেগুলোই প্রথমে কেউ মঞ্চস্থ করার সাহস দেখাত না।

শ্যামল ঘোষ ও মোহিত চট্টোপাধ্যায় জানতেন তাঁদের নাটকগুলো দেখার পর দর্শকদের কী প্রতিক্রিয়া হবে। দেবাশিস দাশগুপ্ত সেই সময়ের স্মৃতিচারণায় বলেছেন—

> ‘ওই নিদারুণ কষ্টের মধ্যে কোনরকম লাভের আশা না রেখে তখন মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামল ঘোষ সাহস দেখিয়েছেন এবং প্রায় শহীদ হয়েছে। তবু আজকের যে নাট্য আন্দোলন তার পরীক্ষার ক্ষেত্রটি মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রস্তুত করে দিলেন। নাটকের সঙ্গে কাব্যের যে নিকট আত্মীয়তা আছে, সেটা আমরা ভুলতেই বসেছিলাম। মোহিত নিজে বলেছেন, ‘তখন আমরা দর্শকের মাথায় থান ইঁট ছুঁড়ে মেরেছি। যতই লোকে বলেছে— ঠিক বুঝতে পারলাম না, ততই আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। সকলের বোঝার মত নাটক লিখি না বলে নিজের পিঠ চাপড়েছি।’ ভাগ্যিস থান ইঁটটা ছুড়েছিলেন, ক্রমশ দর্শকের থিয়েটার বোধ বেড়ে গেল। আচ্ছন্নের মত কেটে যেত সময়টা।’[২]

আসলে সেই সময়টাই ছিল এরকম। সমস্ত ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে এই ট্রেন্ডটাই সেই সময় ছিল।

একের পর এক নাট্যকার ননরিয়ালিস্টিক ধারায় বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ করে নিজেদের নাটক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের যে কোন শিল্প-সাহিত্য দর্শনের প্রভাব অনেক পরে আসে— কিন্তু আসে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে নতুনত্বটা আমদানি হয়েছিল মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। কিন্তু তিনি আক্ষেপ করেছিলেন এই কারণে যে তাঁর নাটক প্রথমে অল্প সংখ্যক দর্শকেরা দেখতে আসত। এভাবে চলা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তিনি আশঙ্কা করতেন হয়তো নির্দেশকরা তাঁর নাটক আর মঞ্চস্থ করার কথা ভাববে না দর্শক সমাগম বেশি না হলে। হয় দর্শকের সংখ্যা বাড়াতে হবে, না হলে নাটক লেখা ছেড়ে দিতে হবে— এই দ্বন্দ্বে তিনি সর্বদা ভুগতেন শুরুর দিকে। তিনি বলেছেন—

“নাটকের প্রতি নিহিত দুর্বলতায় আমি নাটক লেখা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারিনি। আরও বাস্তবমুখী হও, সহজবোধ্য হও, abstraction কমাও, নাটকের বুননে ও বিন্যাসে কৌশলী হও যাতে দর্শক আকৃষ্ট হয়— এরকম একটা পরামর্শের অদৃশ্য চাপ আমাকে নিরন্তর বিচলিত করেছে। অথচ আমি ভাবতাম, When I write, I have a kind of zero-gravity feeling—I can fly wherever I like to go and my characters can defy the laws of physics and laws of gravity— it's a special thing for me. কিন্তু সেই অদৃশ্য পরামর্শ, অদৃশ্য চাপ, দর্শকের মধ্যে বেঁচে থাকার লালসা আমাকে ক্রমশ আপসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই আপস কিংবা থিয়েটারে টিকে থাকার অনন্যোপায় বাসনা থেকে যখন নাটক লিখতে শুরু করলাম, ক্রমশ জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকল, নাটকের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল, একই সময় আমার সাতটি নাটকও মঞ্চে উপস্থিত থাকল। আসতে শুরু করল নানা পুরস্কার, সম্মাননা জানানোর আহ্বান। অনেক সময় পুরস্কার হাতে নিয়ে হাসিমুখে মঞ্চে যখন দাঁড়িয়েছি ভিতরে একটা উদ্‌গত যন্ত্রণা বোধ করেছি। সব সময় না হলেও ক্বচিৎ এই যন্ত্রণা বিচলিত করেছে, দর্শকের করতালির মধ্যে শুনতে পেয়েছি আমার হাহাকার— চোখ বড় চতুর, it can hide

tears।"[৩]

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা নাট্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বাস্তব বিরোধী নাট্য দর্শনকে কেন্দ্র করেই তার সমগ্র নাট্যজীবন গড়ে উঠেছে। অনেকটা কাব্যের সাহায্যে বা কবিতার মতো করে তিনি জীবনের অন্তর্বাস্তবতার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। উদ্ভট চরিত্র, কবিতার মতো প্রকাশভঙ্গি তাঁর নাটকের সঙ্গে বাস্তবধর্মী নাটকের পার্থক্য গড়ে দেয়। আসলে তিনি ছিলেন আদ্যন্ত একজন কবি। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন কবিতার জন্য বলিপ্রদত্ত প্রাণ। একদিকে নিজের সহজাত কবি প্রতিভার গুণ এবং অন্যদিকে প্রতিনিয়ত কবিতা পড়া, কবিতা লেখা, কবিতার চর্চায় আকণ্ঠ ডুবে থাকার ফলে কাব্যবোধ তার মননে ও রক্তের গভীরে মিশে গিয়েছিল। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রথম যৌবনে সৃজনশীলতার চর্চা, পরিবেশ ও বন্ধুবান্ধব ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবনে প্রভাব ফেলে। কবি বন্ধু সুনীল-শক্তির সঙ্গে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় কবিতা লিখতে লিখতে তিনি অচিরেই বাংলার অন্যতম প্রধান কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তারপর নাটক লিখতে লিখতে কবিতা লেখা চিরতরে ছেড়ে দিলেও কবিত্বশক্তি তাঁর মধ্য থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি। নাটক রচনায় কবিপ্রতিভা তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁর নাটকের অসংখ্য চরিত্রের মুখে হারিয়ে যাওয়া কবির না লেখা কবিতা অনুপম ভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীতে ননরিয়ালিস্টিক নাটক রচনাকেই জীবনের ধ্যান-জ্ঞান করেছিলেন। নানা জায়গায় সেমিনারে বক্তৃতায়, সাহিত্য সভায়, আলোচনায়, প্রবন্ধে তিনি বাংলায় বাস্তবধর্মী নাটকের নিয়ম-কানুনকে ভেঙে দিয়ে নন-রিয়ালিস্টিক ধারার একটি আন্দোলনের জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেইসময় পাশ্চাত্যে যেভাবে বাস্তব রীতির শিল্পের সমস্ত ফর্ম ও কনসেপ্টকে ভেঙে সাহিত্য, চিত্র, চলচ্চিত্র প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছিল, বাংলা নাটককেও তিনি সেই পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

"একরকমের মধ্যে আসুক না অন্যরকম। ... নন রিয়ালিস্টিক ভিন্ন স্বভাবের কিছু নাটক আসুক। যত মূল্যবানই হোক কোনো ধারার নাটকেরই দীর্ঘকাল একা মঞ্চ দখল করে রাখা ঠিক নয়, দখলে থাকতেও দিতে নেই।"[৪]

সমগ্র জীবনে কোন নাটকের নির্দেশনা না করে শুধুমাত্র নাট্যকার হয়ে তিনি বাংলা নাটকের ইতিহাসে যে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন তা সমগ্র ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। বাস্তব বিরোধী নাটক রচনা তার সৃষ্টির মূল অবলম্বন হলেও সমগ্র নাট্যজীবনে তিনি বারবার নিজেকে ভেঙেছেন, নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং বারবার নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। জীবনের সবদিক ব্যপ্ত করে তিনি নাটক লিখেছেন। বাংলা নাটকের জগতে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা আধুনিক নাট্যব্যক্তিত্ব। একদিকে পাশ্চাত্য নাটক ও আধুনিক জীবন দর্শনকে সাঙ্গীকরণ করেছিলেন এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি নাগরিক জীবনে তার রূপ দিয়েছিলেন আশ্চর্য শিল্প দক্ষতায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর প্রধান প্রেরণা ও আদর্শ। তাঁর রূপক-সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী নাটক এবং লিরিকধর্মী নাট্যভাষা আত্মস্থ করেই তিনি নবনাট্য নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে

তিনি নতুনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, রূপক-সাংকেতিক-প্রতীকের আড়ালে তার যে নাটকগুলো আসলে দেশ-কাল-সমাজ-রাজনীতির ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্য তুলে ধরে, তার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। একদিকে ব্যক্তিগত জীবনের অন্তর্জগৎ অন্যদিকে দেশ-কাল-সমাজ-রাজনীতিকে চিরন্তন নাট্যরূপ দিতে পেরেছিলেন তিনি— রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের চরিত্রদের সমস্যা-সংকট-দ্বন্দ্ব-অনুভব-চিন্তা-উপলব্ধি অত্যন্ত আধুনিক। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আধুনিক নাগরিক জীবনকে এত অভিনব উপায়ে, উদ্ভট ও আকর্ষণীয় রূপে বাংলা নাটকে আর কেউ তুলে ধরতে পারেননি। নাটকীয়তা বজায় রেখে, নাট্যধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে তার নাটক যেন কাব্যকে ছুঁয়ে থাকে ভালোবাসার মতো। তাঁর রচিত প্রতিটি নাটক যেন এক অদ্ভুত সৃষ্টি— যা আগে কখনো দেখা যায়নি, শোনা যায়নি। তাঁর নাটকের প্রতিটি চরিত্র দার্শনিক সমস্যায় আক্রান্ত, অ্যাবসার্ডবোধ, অস্তিত্বহীনতা ও শূন্যতার অনুভূতিতে চরিত্ররা আচ্ছন্ন— কখনো অস্তিত্বের বিপন্নতায় বিষাদগ্রস্ত। কখনো এক্সপ্রেশনিস্ট ছবির মতো নাটকের চরিত্ররা নিজের অন্তরের আলোয় চারপাশটা বদলে দেয়, কখনো আবার ম্যাজিক দেখায়। বাংলা নাটকে যা ছিল অকল্পনীয়, অসম্ভব— নাট্যকার তাঁর প্রতিভার যাদু বলে তাকে সম্ভব করেছেন। তাঁর সৃষ্ট নতুন নাট্যভাষা, নতুন চরিত্র বাংলা নাটককে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।

তাঁর নাট্যরচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তিনি জীবনের সমগ্র অংশ নিয়ে নাটক লিখেছেন। জীবনের একটা অংশ বা খণ্ড অংশকে তিনি নাটকে তুলে ধরেননি। শুধুমাত্র একধরনের অনুভব, চিন্তা, দর্শন, সংকট, দ্বন্দ্বকে তিনি নাটকে অনেননি। বিষয় ও প্রকরণের বৈচিত্র্য তাঁর নাটকের প্রধান লক্ষণ। আধুনিক ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জীবনকে, একান্ত অনুভবের জগৎকে প্রকাশ করার জন্য তিনি যেমন যত্ন নিয়েছেন, তেমনি সমাজ-রাজনীতির সংকট ও আবর্তের মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে থাকা জীবনের দ্বন্দ্বকে, সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, বিক্ষোভ-বিদ্রোহকে শিল্পরূপ দেওয়ার চেষ্টায় নিজের মনন-মেধা-সৃষ্টিশীলতা প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছেন।

বাংলা থিয়েটারে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব লগ্নে শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, বাদল সরকারেরা বাংলা থিয়েটারের জগৎ শাসন করছিলেন। শম্ভু মিত্র তখন রবীন্দ্র নাটক নিয়ে এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশী নাটকের অনুবাদ নিয়ে মগ্ন ছিলেন। বহুরূপী, এলটিজি, নান্দীকার তখন বিদেশী নাট্যকারদের মধ্যে ইউজিন ও নীল, চেকভ, সোফোক্লেস, গোর্কি, ইবসেন, কিলফোর্ড অডেটস, বার্নাড শ, ব্রেশ্ট, পিরান দোল্লার অনূদিত নাটকের প্রযোজনা করছিল। বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত তখন অসামান্য প্রতিভা ও প্রবল প্রতাপ নিয়ে বাস্তববাদী তথা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে বাংলা নাটকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঠিক সেই সময় বাস্তববাদের সম্পূর্ণ উল্টো পথে হেঁটে অজ্ঞাতপরিচয়, আগন্তুক, উদ্ভট চরিত্র নিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা থিয়েটারের জগতে আবির্ভাব।

তিনি পাশ্চাত্য নাটকের শুধু অনুবাদ করেই থেমে থাকেননি। বিদেশী নাটক, নাট্যরীতি ও

দর্শনকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে দেশের মাটিতে বিদেশী নাটকের বীজ বপন করছিলেন। তারপর সেই বীজের অঙ্কুরোদগম হয়ে চারাগাছের সৃষ্টি হলে বাঙালি সংস্কৃতির জল হাওয়ায় অতি যত্নে চারা গাছটিকে বড় করতে চাইলেন। বাঙালি ভাবের নরম রোদে, কবিতার বারিবর্ষণে, শ্রেষ্ঠ চিন্তা-দর্শনের উপযুক্ত সার প্রয়োগে চারাগাছটিকে প্রতিনিয়ত যত্ন করতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে একদিন চারাগাছটি বিশাল নাট্যবৃক্ষে পরিণত হল। আশ্চর্য হয়ে গেলেন সবাই। সেই নাট্যবৃক্ষটিকে নানা নামে ডাকা শুরু হল। নাট্যবৃক্ষের ছায়ায় পাঠক, নির্দেশক, অভিনেতা, দর্শকেরা পথিকের মতো আশ্রয় নিলেন। নাট্যবৃক্ষের ফুলের মতো সংলাপের সৌরভে সবাই মেতে উঠলেন। নাট্যবৃক্ষটি ফলের মতো অদ্ভুত এক দৃশ্যের জন্ম দিল— দৃষ্টি দিয়ে, শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে অনেকে সেই দৃশ্য ফল খেতে লাগলেন। অদ্ভুত, অপূর্ব, উদ্ভট, আশ্চর্য, সুন্দর রসে সবার হৃদয়ের ক্ষুধা মিটল। প্রোটাগনিস্ট চরিত্ররা নাট্যবৃক্ষের মূলকাণ্ড হয়ে আকাশের দিকে উন্নত হয়ে রইল। অপ্রধান চরিত্ররা নাট্যবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা হয়ে মূলকাণ্ডের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। আর সেই নাট্যবৃক্ষের শিকড় বাঙালির হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। কেননা নাট্যবৃক্ষের স্রষ্টার কথায় 'হৃদয়ের থেকে ভালো বাসভূমি নেই।'

রাষ্ট্র থেকে, সমাজ থেকে, পরিবার থেকে যারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন মনে করেন, বা যাদের জোর করে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে বা নিজেরাই স্বেচ্ছায় যারা বিচ্ছিন্ন, নাট্যকার তাদের নাটকে স্থান দিলেন। তাঁর নাটকের চরিত্ররা কখনো একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য হাজার বছর ধরে অপেক্ষারত প্রেমিকের ভান করে। মূলত মধ্যবিত্ত ভীরু স্বভাবের এই চরিত্রদের কোন উচ্চাশা নেই, প্রবৃত্তির ক্ষুধায় তারা তাড়িত নয় — ভালোবাসার ক্ষিদেয় তারা ক্ষুধার্ত, দার্শনিক কারণে তারা আলোড়িত, দার্শনিক জিজ্ঞাসায় তারা কৌতূহলী— কাব্যের ভাষায় প্রত্যেককে কবি মনে হয়। অ্যাবসার্ড আচ্ছন্ন, অস্তিত্বের সংকটে বিপন্ন নায়ক চরিত্রদের নাট্যকার অবাস্তব রূপে নাটকে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু বাকি চরিত্রদের নাট্যকার সম্পূর্ণ বাস্তব রূপেই নির্মাণ করেছেন।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মনে হয়েছে যে, একজন কবি ছাড়া মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকগুলি কেউ লিখতে পারত না এবং তাঁর নাটকে উপমার সম্প্রসারণ ঘটেছে। সৌমিত্র বসু বলেছেন— ''মোহিত যা লিখেছেন তাঁর একটা বাস্তব ভিত আছে, কিন্তু সেই বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসে, নিজেরই ভিতর থেকে বের করে আনে এক অন্য অচেনা পৃথিবীকে, যে সব শব্দ বাস্তবকে প্রকাশ করবার জন্যেই ব্যবহার করার কথা, মূলত উপমা ব্যবহার বা শব্দ নির্বাচনের কারণে সেখানে একটা অন্য তার এসে লাগে— তখনই নাটকের অন্তরে গড়ে ওঠে কবিতা। ... কিংবা বলা যায়, বাস্তবের সম্প্রসারণ। নাট্যের বা তার উৎস হিসেবে লিখিত নাটকের একটা বড় স্বাধীনতার জায়গা হল তাকে বাস্তবের দাসত্ব করতে হয় না, এমনকি সম্ভাব্যতারও নয়, নিজের মতো করে ভুবন তৈরি করবার পূর্ণ অধিকার আছে নাট্যনির্মাতাদের।''[৫]

নাটকের মধ্যে অবাস্তবতা এনে তিনি প্রচলিত বাংলা নাটকের সমস্ত গতানুগতিকতা ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে বাস্তবাদী নাটক লিখতে লিখতে একটু অন্যরকম নাটক লেখার চেষ্টায় বাস্তবের

উল্টো পথে হাঁটেননি। তিনি তাঁর প্রথম নাটকেই বাংলা নাটকের সমস্ত ফর্ম, কনটেন্ট ভেঙে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকটি 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে নাটকের প্রাযোজনার যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল তা বাংলার থিয়েটারের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। গন্ধর্ব পত্রিকায় সেদিন নাটকটি সম্পর্কে সম্পাদকের নিবেদন ছিল—

> ''গগনেন্দ্র নাথের চিত্রকলার মতো, জীবনানন্দের কবিতার মতো, সুকুমার রায়ের ছড়ার মতো কিংবা আয়েনেস্কোর অসম্ভব সিচুয়েশন সৃষ্টির মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের বাংলা নাটকটির রচয়িতা একজন কবি। গন্ধর্ব এই নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব দিয়েছেন আর একজন কবির ওপর। একটি ভালো কবিতার মতোই এই নাটকের পস্টারিটি। ইন্দ্রিনীল চট্টোপাধ্যায় গন্ধর্বর এই নতুন প্রযোজনায় পরস্পর বিরোধী মন্টাজ যোজনার মধ্য দিয়ে অভিনব প্রয়োগ কল্পনার প্রস্তাব নিরূপণে ব্রতী।''[৬]

কবি হওয়ায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় এত সহজ সুন্দর নাটক লিখতে পেরেছেন বলে নাট্যকার অভিনেতা মনোজ মিত্র তা মনে করেন না। তিনি বলেছেন— ''... কত সহজভাবেই না জীবনের অন্তর্নিহিত কথা, আপাত-অবাস্তব কথা, বস্তুজগতে যা পাওয়া যায় না তার তলে নেমে, গভীরে নেমে, তার আড়াল থেকে মনের ইচ্ছেগুলো— সত্যগুলোকে বের করে আনা। যে মানুষ এগুলো ফুটিয়ে তুলতে পারে সে শুধু কবি— এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। মোহিতবাবু কবি বলেই এটা পেরেছেন— এমনটা বললে তাঁর নাটক লেখার শক্তিকে অস্বীকার করা হয়। সে যে এতো বড় মাপের একজন নাট্যকার— সে কথাটাকেই অস্বীকার করা হয়। তুচ্ছ ও অনাদর করা হয়।''[৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক সমাজ-পরিবেশের মধ্যে জটিলতা এসে যাওয়ায়, মানুষের চিন্তা-ভাবনা-কার্য-আচরণ-অভিব্যক্তি তথা প্রকাশ ভাবনার মধ্যে জটিলতা এসে যাওয়ায় বাস্তববাদী শিল্প প্রকরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ মানুষকে তুলে ধরা সম্ভব ছিল না। বাস্তববাদী শিল্প প্রকরণে যেহেতু মানুষের জীবনের সারফেস রিয়ালিটি বা উপরি বাস্তবের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, মানুষের অন্তর্বাস্তবকে উপেক্ষা করা হয়, তাই বাস্তবের বিরোধিতা করে সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্প প্রকরণকে নাট্যকার আশ্রয় করেছিলেন। যেহেতু মানুষ তার নিজের ভিতরে যতটা সত্য, সেই সত্যিটাকে সে বাইরের বাস্তব পরিবেশে সব সময় প্রকাশ করতে পারে না, দীর্ঘদিনের অভ্যাস, সংস্কার এবং সমাজ-পরিবেশের বদ্ধমূল গতানুগতিকতার উল্টো পথে হাঁটার ভয়ে। তাই ভিতরের সেই সম্পূর্ণ সত্যিটা প্রকাশ করার জন্য বিমূর্ততা এবং নানা রূপক-সাংকেতিক প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন নাট্যকার। মানুষের জটিলতাকে, পরিস্থিতির জটিলতাকে ধরবার জন্য তাঁকে বাস্তবের ভিন্ন পথে হাঁটতে হয়েছে। যদিও তিনি সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারেননি, বাস্তব-পরাবাস্তবের মিশেলে তিনি নাটকে নানা চরিত্র নির্মাণ করেছেন এবং তাদের সংলাপ, আচার-আচরণ, অঙ্গভঙ্গিতেও সেই মিশেল রয়েছে।

বিজ্ঞানের জগতে কার্যকারণ সম্পর্কহীনতার আবিষ্কার পাশ্চাত্যে ননরিয়ালিক সাহিত্য- নাট্য-শিল্প প্রকরণের জন্মের পিছনে দায়ী। ভাষার ক্ষেত্রেও বাস্তব বিরোধী নাটকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ

করা যায়। গদ্যের ভাষা যুক্তির ভাষা, কার্যকরণ সম্পর্ক ও বাস্তবতা প্রকাশের মূল বাহন। বাস্তবতাকে মূল ভিত্তি করে যে গল্প, কাহিনি, নাটকের প্লট গড়ে ওঠে, কাহিনির যে বিন্যাস গড়ে ওঠে, যে চিন্তা গড়ে ওঠে, তা প্রকাশের সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম হল গদ্যভাষা। কিন্তু অযৌক্তিকতা, কার্যকারণ সম্পর্কহীনতা, উদ্ভটতা প্রভৃতি অবাস্তবতা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন কাব্যভাষা। অন্তর্বাস্তবতা, পরাবাস্তবতা, ড্রিম ফ্যানটাসি, রূপক-সাংকেতিকতা প্রভৃতি বিমূর্ততা প্রকাশের জন্য কাব্যের ভাষা সবচেয়ে উপযোগী। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর সমগ্র নাট্যজীবনে তাঁর চরিত্রদের মুখে এই কাব্যভাষার ব্যবহারকে একটা শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষতা ও সৌন্দর্যের জায়গায় নিয়ে গেছেন। এবং আধুনিক চিন্তা-চেতনা-উপলব্ধির প্রকাশের জন্য সচেতনভাবে একটা নতুন নাট্যভাষার জন্ম দিয়েছেন নাট্যকার। চরিত্রদের উদ্ভট আচার-আচরণের সঙ্গেও এই ভাষা সহজেই সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছে। শ্লেষ, উইট, কৌতুক, বুদ্ধিরও প্রকাশ ঘটিয়েছেন অনায়াসে সহজ-সরল বন্ধনহীন ভাষায়। যদিও নাট্যকার যত বেশি নাটক লিখেছেন ও পরিণত হয়েছেন, ধীরে ধীরে কাব্যভাষার প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন। তিনি যখন বাস্তবধর্মী নাটক লিখেছেন কাব্য প্রভাব মুক্ত গদ্যভাষার ব্যবহারেও শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন।

নাট্যকার বলেছেন, ‘‘বাস্তব জগতে চলাফেরা করা মানুষ হিসেবে আমি একটা মানুষ, আবার আমার ভিতরে আর একটা মানুষ। সেই মানুষটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় More real, বেশি বাস্তব এবং বেশি সত্য, কারণ নিজের কাছে নিজের ছলনা থাকে না। ... প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কিন্তু দুটি সত্তার উপস্থিতি কাজ করে, আমি যখন নাটক লিখতে চেয়েছিলাম আমি তখন দুটোকে মিলিয়ে একটা মানুষকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলাম। ... ভেতরের মানুষ আর বাইরের মানুষ মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ মানুষ হয়— যে মানুষটা আসল মানুষ, সেই অর্থে realistic। ... আমার মনে হয় আমি যে প্রক্রিয়ায় এই নাটকগুলি লিখি সেটা আমার ভেতরের একটা সত্যানুসন্ধানী মন থেকে লিখি, আমার মতো করে একটা সত্যকে ধরবার চেষ্টা করা, মানুষকে ধরবার, বুঝবার চেষ্টা করা, তার আচরণকে ধরবার চেষ্টা করা— সেই অর্থে এই প্রক্রিয়ায় আমি ভাবি বলে আমার নাটকের মধ্যে চেনা বাস্তবের ছকের বাইরে আর একটা চেহারা চলে আসে।’’[৮]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের নাটকের চরিত্ররা আদর্শবাদের দ্বারা বা তার বিপরীতে প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত নয়— অস্তিত্বের দ্বারা লক্ষ্যহীন-উদ্দেশ্যহীন-অর্থহীন পথে তাদের যাত্রা। এক ধরনের আত্মবিরোধী বিষণ্ণতা দ্বারা তারা আচ্ছন্ন। যুগযন্ত্রণার কারণে তারা বিপন্ন, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ও মানসিক যন্ত্রণায় তাদের আত্মা জর্জরিত। এর জন্য তারা সমাজ বা রাষ্ট্রকে দায়ী করেনা— নিজের অস্তিত্বকেই দায়ী করে। অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, অস্তিত্বহীনভাবে বেঁচে থাকাটাই তাঁদের লড়াই-সংগ্রাম। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার পর সর্বত্র একধরনের হতাশা, নৈরাশ্য, আশাহীনতা, নাস্তিকতা, নেতিবাচক অন্ধকার গ্রাস করে দর্শন, মনন ও চেতনার জগতে। নাট্যকারের প্রথম পর্বের নাটকের চরিত্রদের উৎস এখানেই। চরিত্ররা তাদের যন্ত্রণা জর্জরিত অস্তিত্বের জন্য কখনো জন্মদাতা পিতাকে দায়ী করে, কখনো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কখনো আত্মহত্যায় মুক্তি পেতে চায়, কখনো আবার ভালোবাসার কাছে

আত্মসমর্পণ করতে চায়। পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড দর্শনের প্রভাব নাট্যকারের প্রথম পর্বের নাটকে দেখা গেলেও শেষপর্যন্ত অ্যাবসার্ড চেতনাকে তিনি জয়ী করেননি। বরং অ্যাবসার্ড-বোধ থেকে, জীবনের সমস্ত অন্ধকার থেকে উত্তরণের কথা বলেছেন ও আশার পথ দেখিয়েছেন তিনি। এর কারণ হল রবীন্দ্রনাথ ও মার্কসীয় দর্শনে তাঁর গভীর আস্থা। রবীন্দ্রনাথের নাট্যদর্শনে তথা সামগ্রিক জীবন দর্শনে আশাহীনতা, বিশ্বাসহীনতার কোন স্থান নেই, তিনি চিরকাল জীবনের জয়গান গেয়েছেন, অনন্ত আশার আলো দেখিয়েছেন। অন্যদিকে বামপন্থী সমাজ দর্শনে নাস্তিকতা প্রধান ভিত্তি হলেও, মানুষই সেখানে ঈশ্বর, মানুষের জাগরণে এবং সমাজ রাষ্ট্রের পরিবর্তনে নতুন ভোরের আলোর প্রত্যাশী বামপন্থী মতাদর্শীরা। এই দুই জীবনবোধে আস্থার কারণে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে অ্যাবসার্ড দর্শনের প্রভাব থাকলেও তা নাটককে সম্পূর্ণ গ্রাস করেনি।

নাট্যকার তাঁর নাটকের মধ্যে ম্যাজিকের ব্যবহার করেছেন। যে ম্যাজিকটা চেনা জগতের মধ্যে একটা অচেনা জগৎ তৈরি করেছে। একটা জাদুকরী মায়ার সঞ্চার করেছে। এই ম্যাজিকটা তাঁর নাটকের মধ্যে একটা 'সম্মোহন' তৈরি করে, একটা বিস্ময় জাগায়, একটা আচ্ছন্নের জগৎ তৈরি করে এবং অদ্ভুত বলে মনে হয়। তাই ''বাংলা থিয়েটারে তিনি এমন একজন নাট্যকার যাকে সবসময়ই মনে হয় জাদুকর। তাঁর হাতে আছে ম্যাজিক। এই ছিল ছুরি, হল ফুল। ছিল কালি, হল চাঁদ।''[৯]

তিনি থিয়েটারের মধ্য দিয়ে জীবনের বাস্তবতা, সত্যের অনুসন্ধান করেছিলেন। জীবনের থেকেও বড় সত্যকে খুঁজেছিলেন নাট্যশিল্পে। নিজের প্রতিভার জাদুর ছোঁয়ায় জীবন সত্যকে নাটকে ধারণ করতে চেয়ে তিনি একটা নতুন শিল্পরীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন প্রত্যেক যুগে নতুন একটা শিল্পরীতির জন্ম হয়, আবার ধীরে ধীরে সময়ের অভিঘাতে সেই রীতিটা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। একটা রীতির সঙ্গে আরেকটা রীতির দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে নতুন যে রীতির জন্ম হয়, তাকে আশ্রয় করে বৃহত্তর জীবন-সত্য শিল্পে প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা নাটক গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে, লেবেদফ থেকে শুরু করে মধুসূদন, দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, মন্মথ, শচীন্দ্রনাথ সহ বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত সবাই বাস্তবধর্মী নাটকের পথেই হেঁটেছেন। কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে—

> ''দর্শকের মধ্যে যে একটা অবসাদ, বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যে একটা ক্লান্তি মধ্যে মধ্যে দেখি— ভালো নাটক, তা সত্ত্বেও— তার বড় কারণ হচ্ছে দর্শকের ভেতরে যে বিচিত্রের ক্ষুধা থাকে, শিল্পের কাছে সেটার যদি বঞ্চনা ঘটে সুদীর্ঘকাল ধরে— তাহলে তার মধ্যে তার অজ্ঞাতেই একটা কীরকম ক্লান্তি এসে যায়, একটা অপছন্দের ভাব কোথায় এসে যায়।''[১০]

নতুন কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থেকে, রক্তের মধ্যে বৈচিত্র্যের ডাকে সাড়া দিয়ে বহুমুখী জিনিসের মধ্যে নিজের আস্বাদ খুঁজতে খুঁজতে তিনি বাংলায় একটা নতুন নাট্য প্রকরণের জন্ম দিয়েছিলেন। একটা নতুন নাট্যভাষা, নতুন চরিত্র, নতুন বক্তব্য, নতুন বিষয় নাটকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। আর এ

ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিল তাঁর আদর্শ। যদিও বিজন ভট্টাচার্য চল্লিশের দশকে 'নবান্ন' নাটক দিয়ে বাংলা বাস্তববাদী নাটকের একটা বৈপ্লবিক ধারার জন্ম দিয়েছিলেন। নবান্ন বাংলা নাটকের সমস্ত গতানুগতিকতা ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায় মনে করতেন 'রবীন্দ্রনাথের নাটক-ভাঙা নাটকের খেলা' আর 'নবান্নের ধারা' দুটো ধারাই পাশাপাশি চললে বাংলা নাটক বেশি উপকৃত হত। অনেক বেশি বৈচিত্র্যতার সৃষ্টি হত। কিন্তু তাঁর আক্ষেপ সেটা হয়নি দেখে।

যদিও চিরন্তন-শাশ্বত কোনকিছুর অস্তিত্ব বাস্তব পৃথিবীতে নেই। তবু মহান স্রষ্টার, শিল্পীর কোন কোন শিল্প সৃষ্টির আবেদন মানব সমাজে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে ব্যক্তি ও সমাজ-রাষ্ট্র জীবনের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরলেও তা সমস্ত দৈনন্দিনতা ও সমসাময়িকতার উর্দ্ধে সুদূর প্রসারী একটা আবেদন সৃষ্টি করেছে। তাঁর প্রথম পর্বের 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকে অজ্ঞাত পরিচয় লোকটির যে সমস্যা, তা একজন মাঝারি মাপের শিল্পীর আত্মপ্রকাশের চিরকালীন সমস্যা। আগন্তুক লোকটির কণ্ঠে সূর্য আটকে যাওয়ার প্রতীকে যা দেখানো হয়েছে। 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকে আগন্তুক লোকটিও ডাক্তারবাবুর অ্যাবসার্ড আচ্ছন্নতা, অস্তিত্বহীনতা ও লস্টনেসের বোধ আজকের পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু রাষ্ট্র-সমাজের দীর্ঘকালীন অন্ধকার সময়ের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির হৃদয়ে চিরস্থায়ী মনে হয়। 'নীল রঙের ঘোড়া' নাটকে অতিরিক্ত ভোগ-লালসা চাহিদার মধ্যে আত্মার বিযুক্তির ফলে ট্রাজেডির সুর আজকের ভোগোন্মত্ত নাগরিক জীবনেও সমান সত্য। যতদিন প্রেম থাকবে 'গন্ধরাজের হাততালি' নাটকের ভালোবাসার রজনীগন্ধার সুঘ্রাণ মানুষকে মাতিয়ে রাখবে। 'রিং' নাটকের স্বামী-স্ত্রী অরুণ-শীলা তাদের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, নীচতা ভুলে ভালোবাসার উদারতার রিং-এ বসে যেন আজও দুলে যাচ্ছে। 'বাইরের দরজা' নাটকে মানুষের সদাজাগ্রত যে বিবেকের কথা আছে— যতদিন মানুষ থাকবে, মানুষের মন থাকবে, বিবেকও বেঁচে থাকবে— কখনো কোনদিন যেন মানুষের বিবেকের মৃত্যু না হয়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের বিশেষত্ব এখানেই। তিনি যে মানবিক বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন, আধুনিক যুগের হয়েও তার আবেদন চিরকালীন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে মঞ্চ সজ্জায় বিচিত্র আলোর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্র শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পে অন্তর্সত্যকে তুলে ধরাই চিত্রকরের মূল উদ্দেশ্য। এই কারণে বহু বিচিত্র বর্ণ তথা রঙের মাধ্যমে তারা চিত্রকে সজীবতা দান করে। গতিহীন চিত্রকে নানা রঙের ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত ও গতিশীল করে তোলে। ঠিক তেমনি এক্সপ্রেশনিস্ট নাটকেও রঙের পরিবর্তে বিচিত্র আলোর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নাটকের একটি বা দুটি দৃশ্যের মাধ্যমে অনেকসময় ভাবসত্যকে তুলে ধরা যায় না। কিন্তু প্রতিদৃশ্যে আলোর বর্ণচ্ছটার দ্বারা সহজেই বিমূর্ত অন্তর্সত্যকে প্রতীকের মাধ্যমে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। বহু বর্ণের আলোর ব্যবহার নাটকের দৃশ্যের প্রতিটি ঘটনাকে সজীবতা ও গতি দান করে। সঙ্গীতের মতো দ্বন্দ্ব, তাল, লয়ের মতো অপূর্ব সুরতাল সৃষ্টি করে আলোকরাজি। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে তাই বহুবর্ণের আলোর নির্দেশ নাটকের দৃশ্যকে উচ্চামাত্রায় নিয়ে যায় এবং সম্পূর্ণতা ও সুষমা দান করে।

নাট্যকার ফর্মের ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পর্বের নাটকগুলিতে পূর্বের সমস্ত নিয়ম-রীতি ভেঙে দিয়েছিলেন। অ্যারিস্টটল নির্দেশিত নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর নাটকে কাহিনির অস্তিত্ব সেভাবে নেই, থিম ও সিচুয়েশন এর উপর নির্ভর করে তাঁর বেশিরভাগ নাটকগুলো মূলত গড়ে উঠেছে। এছাড়া তাঁর নাটকে সব এক্সপোজিশন, রাইসিং অ্যাকশন, ক্লাইমেক্স, ক্যাটাসট্রফি নেই। নাটকের চরিত্রগুলো কোথা থেকে এসে আবার কোথায় যায় বোঝা যায় না। অনেক নাটকে যুক্তি ও কার্যকারণ সম্পর্কের কোন অস্তিত্ব নেই। চরিত্ররা অস্তিত্ব সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন জাগিয়ে দেয়। চরিত্রের মধ্যে অ্যাবসার্ড নাটকের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া তাঁর নাটকে ভাষার ক্ষেত্রে যে কাব্যের প্রভাব দেখা যায় তা এক্সপ্রেশনিস্ট লক্ষণাক্রান্ত। তাঁর নাটকে স্থান-কাল ও কার্য্যের ঐক্য দেখা যায় না। এছাড়া নানা ঘটনা ও নাটকীয় অ্যাকশনের মধ্যে অযৌক্তিক উদ্ভটতা লক্ষ করা যায়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় নিজে কখনো মঞ্চে অভিনয় করেননি। কিন্তু তিনি অন্তরের জগতে ছিলেন একজন প্রকৃত অভিনেতা। অরুণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ''তিনি যখন তার নাটকের কাহিনি-প্লট-অ্যাকশনের ব্যাখ্যা দিতে চাইতেন— তখন তাঁর বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ, তার মুখের অভিব্যক্তি এমনই জীবন্ত লাগত, মনে হতো মঞ্চে এমন অভিনয় করতে পারলেই তো কেল্লাফতে! এবং তিনি এটা অনায়াসে পারতেন বলেই অন্যের কাজের সুচারু ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। আমাদের নির্ণয় নাটকের মহলা দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা ভুলব না। যখন যেখানে নাটক বাঁক নিয়েছে, যখন অভিনেতা অভিনেত্রীরা দৃশ্য অনুযায়ী সংলাপ অথবা ঘটনার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন— এত স্পষ্টভাবে তাঁর কাছে ধরা পড়েছে এবং এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে তিনি তা ব্যাখ্যা করলেন সকলেই বিস্মিত! খুব বড় মাপের Performer ছাড়া এইভাবে বসে বসে কথাচ্ছলে হুবহু এসব তুলে ধরা সম্ভব নয়।''[১১]

নাট্যকারের রাজনৈতিক নাটক সম্পর্কে পাচু রায় বলেছেন—

> ''গূঢ় বিচারে সেটিই রাজনৈতিক নাটক, যা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুখোমুখি জেহাদ। মোহিত চট্টোপাধ্যায় সত্তরের দর্শকে এমনই দুটি নাটক রচেছিলেন। তখন 'কল্লোল', 'অঙ্গার', 'তীর', আমরা দেখে ফেলেছি। প্রতি কাজই একাধিকবার। এই তিন নাটকের যে সর্বজনীন অভিঘাত বা আলোড়ন তা 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা' ও 'রাজরক্ত'-এ ছিল না। কিন্ত অকপটে মানতে হবে, মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত রাজনৈতিক গভীরতা সম্পন্ন ঐ দুটির মতন কোনো নাটক তখন পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারে আসেনি। মোহিতদা মারা যাওয়ার পর এক স্মরণসভায় সত্তরের দশকে যাঁরা 'রাজরক্ত' করেছিলেন সেই মায়া ঘোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়, রাম মুখোপাধ্যায় ও বিভাস চক্রবর্তী পাঠ করেছিলেন 'রাজরক্ত'। আমি যেতে পারিনি। এই প্রসঙ্গে এক ঘরোয়া আড্ডায় বিভাস দা বলেছিলেন, মুগ্ধ শ্রোতারা নাকি সেদিন আবার 'রাজরক্ত' মঞ্চস্থ করবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছেন। অর্থাৎ চল্লিশটি বছর ধরে একটি নাটকের এমন আবেদন! আমরা জানি, ইতিপূর্বে 'কল্লোল' এর

রিমেক সুপার ফ্লপ হয়েছিল। সরকারি উদ্যোগে গিরিশ চন্দ্র ঘোষের ‘বলিদান’ প্রযোজনা সুঅভিনীত হলেও সার্থক হয়নি। কিন্তু ‘ক্যাপ্টেন হুর্‌রা’ ও ‘রাজরক্ত’-এর রাজনৈতিক আবেদন যেন শাশ্বত।”[১২]

প্রথমের দিকে বামপন্থীরা তাঁর নাটককে স্বাগত জানাননি। তাঁর নাটককে ‘অরাজনৈতিক’ ও ‘প্রতিক্রিয়াশীল’ আখ্যা দিয়েছিলেন। ‘মার্কিন ছদ্মবেশী চর’ হিসেবেও তাঁর নিন্দা করেছিলেন। তিনি প্রথমের দিকে অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পরের দিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের পর তিনি সিপিআই-এর সঙ্গেই ছিলেন। সিপিআই তখন কংগ্রেসের সঙ্গে ফ্রন্টে ছিলেন। পাচু রায় বলেছেন—

“তখন সিপিআই-কে কংগ্রেসের ‘বি-টিম’ বলতো সিপিএম। আমাদের তথা সিপিএম-এর কাছে এই ‘বি-টিম’-এ তখন ছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়েরা। শুধু ‘বি-টিম নয়, ১৯৯২-এ যে রিগিং হয়েছিল, যে কংগ্রেসী সন্ত্রাস হয়েছিল তার অংশীদার ছিলেন সিপিআই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক। ... তখন কাগজে কলমে এদের সমর্থক ছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতন বহু বুদ্ধিজীবী যাঁদের মধ্যে অনেকেই পরে সিপিএম-এর সমর্থক হয়েছিলেন।

তুমি আমার সঙ্গে থাকলে তোমার সব দোষ হবে মাপ, আর না থাকলে তোমার সব গুণ বরবাদ।’ দলতন্ত্রের এই মৌলিক তত্ত্বটি আজকে নয়, তখনো ছিল প্রবল। ফলে বাংলায় একেবারে অন্যধরনের এক নাট্যকার এবং কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায় তখন ‘আমাদের কাছে নাই’, ‘কিচ্ছু না’, নিছক এক ‘দালাল’। তখন বহু বুঝদার পার্টিম্যানকেও বোঝাতে পারেনি যে, একজন মানুষের রাজনৈতিক সত্তা ও শিল্পী সত্তা যেমন এক হতে পারে, আবার তেমন ভিন্নও হতে পারে। নিজে এই বিশ্বাসে তখন এবং এখনো দৃঢ় থেকে, তখন থেকে দেখে যাচ্ছি সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে একদেশদর্শিতার মূঢ় আস্ফালন। কেউ একথা বুঝতে চায়নি, যে মানুষটা ‘ক্যাপ্টেন হুর্‌রা’ লেখেন তিনি কখনো রাষ্ট্রশক্তির ‘দালাল’ হতে পারেন না, তাঁকে কখনো ‘নাই’ করা যায় না। উনি যখন ‘ক্যাপ্টেন হুর্‌রা’ লেখেন তখন তো সিপিআই আর কংগ্রেস হাত ধরাধরি করে চলছে। ... এমনকি ১৯৭৪ সালে ‘রাজরক্ত’ লেখার সময়ও সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক আর কংগ্রেস ছিল হাত ধরাধরি করে।”[১৩]

তিনি পার্টি সদস্য কখনই ছিলেন না, কিন্তু অবিভক্ত অবস্থায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যেমন ছিল, পার্টি ভাগের পর সিপিএমেরও একনিষ্ট সমর্থক ছিলেন আমৃত্যু। দেবাশিষ সেনগুপ্ত বলেছেন, “আমরা জানি যে পার্টি ভাগের পর তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দরদী সমর্থক ছিলেন এবং জরুরী অবস্থার সময়ে যুব কংগ্রেস কর্মীরা তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর চালায়, নাটকের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেয়।”[১৪]

সৌভিক রায়চৌধুরী, তাঁর নাটক সম্পর্কে বলেছেন—

“তাঁর নাটককে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল দীর্ঘকাল, সেগুলি ‘অনভিনেয়’ এই আখ্যা পেয়েছে

বারংবার। 'উদ্ভট', 'দুর্বোধ্য', 'উদ্বায়ুগ্রস্ত', 'খামখেয়ালি পনার নিদর্শন' ইত্যাকার নানা বিশেষণে মুহুর্মুহু আঘাত হানা হয়েছে মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর নাটককে। সর্বোপরি প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগ তো ছিলই। পরমাশ্চর্য, কেউ তলিয়ে দেখলেন না যথার্থ সত্যর সমকালীন কবির মতো মোহিত তাঁর কাব্যমানসের সম্প্রসারণ ঘটালেন চারপাশে যখন হতাশা, নৈরাশ্য, 'অদ্ভুত আঁধার'— মোহিত আর সকলের মতো তার আলোচিত্রীয় বিবরণ দাখিল করলেন না বাস্তবাদী ফটোগ্রাফারের মতো। তিনি নির্মাণ করলেন এক দূরত্ব— সময়ের সঙ্গে, হয়তো বা তাঁর নিজের সঙ্গেও এবং একের পর এক নাটক উঠে আসতে লাগল ধ্বস্ত সময়ের ভয়ানক সব প্রতিক্রিয়ায় শিল্পিত রূপ কীভাবে আপাত বাস্তবের কাঠামো ভেঙে পড়ে চুরমার হয়ে যায়, অবচেতনের ভাষায় গর্জে ওঠে অবদমিত মানবাত্মা।"[১৫]

গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল যুগের ধর্মীয় পৌরাণিক দেবদেবীর ভক্তিতে গদগদ বাংলা নাটককে উদ্ধার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা নাটকে অসামান্য সমাজবাস্তবতার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর 'কালের যাত্রা', 'রথের রশি', 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী' নাটকের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। যেখানে রূপক-সাংকেতিক-প্রতীকের ব্যঞ্জনার দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাদপদতাকে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণ ও অবক্ষয়কে আঘাত করা হয়েছে এবং প্রান্তিক, অচ্ছুত, সর্বহারা শূদ্র শ্রেণির জাগরণের কথা বলেছেন। ঠিক তেমনি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের নাটকে আমরা তাঁর অসামান্য সমাজ-রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাই। তিনি 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'রাজরক্ত', 'ক্যাপ্টেন হুররা', 'নিষাদ', 'বাঘবন্দি', 'মাছি', 'দ্বীপের রাজা' প্রভৃতি নাটক রচনা করে বাংলা সামাজিক-রাজনৈতিক নাটকে অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের পথে হেঁটে। রাজনৈতিক চেতনা, বিদ্রোহ, বিপ্লবের জাগরণে বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত বাস্তববাদী যে ধারার সৃষ্টি করেছিলেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায় কনটেন্টের ক্ষেত্রে সেই পথে কিছুটা হাঁটলেও ফর্মের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব একটা পরিবর্তন এনেছেন। তিনি সত্তরের দশকের অগ্নিগর্ভ, রক্তাক্ত দিনের চিত্র এঁকেছেন— বিদ্রোহের দিনে মধ্যবিত্তের আদর্শ-দ্বন্দ্ব-সংকট-পিছুটান-জাগরণ, দেখিয়েছেন। তাঁর নাটকের মধ্যমণি শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তরা। রাজনৈতিক নাটক যে সমসাময়িকতাকে সম্পূর্ণ রূপে নাটকের কেন্দ্রে স্থান দিয়েও দীর্ঘকালীন সুদূরপ্রসারী আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলো তারই প্রমাণ। নাট্যকার আজীবন মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এর ফলে তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনকে তাঁর নাটকে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন শিল্পসম্মতভাবে। ধনতান্ত্রিক সমাজ রাষ্ট্রব্যবস্থার শোষণ, শৃঙ্খল, অত্যাচার, নিপীড়নের কথা এবং জাগরণ, বিদ্রোহ, বিপ্লবের কথা বললেও তা স্লোগানধর্মী ছিল না। তার রাজনৈতিক চেতনার উৎস হল বামপন্থা। কিন্তু বৈপ্লবিক দর্শনকে প্রচার প্রোপাগাণ্ডার উর্দ্ধে তুলে ধরে শিল্পসম্মতভাবেও নাট্যরূপ দেওয়া যেতে পারে তা তিনি সম্ভব করেছিলেন।

মাও-সে-তুঙ তাঁর ইয়ানান ফোরামের বক্তৃতায় সাহিত্য এবং শিল্পের উপরে বলেছিলেন—

"What we demand is the unity of politics and art, the unity of content and form, the unity of revolutionary political content and the highest possible perfection of artistic form. Works of art which lack artistic quality have no force, however progressive they are politically. Therefore we oppose both the tendency to produce works of art with a wrong political viewpoint and the tendency towards the " Poster and slogan style" which is correct in political viewpoint but lacking in artistics power. On questions of literature and art we must carry on a struggle on two fronts."[১৬]

একদিকে শ্রেষ্ঠ শৈল্পিক সৌন্দর্য অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক জ্ঞান-দর্শন উভয়ের একাত্মতার কথা মাও-সে-তুঙ বলেছিলেন। এখানেই শিল্প-সাহিত্যের সার্থকতা। যে কোন একটির অভাব ঘটলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে এই দুইয়ের সম্মিলন ঘটেছিল। তাই সত্তরের দশকে লেখা নাটকের আবেদন একবিংশ শতাব্দীতেও একটুও ম্লান হয়নি। 'রাজরক্ত', 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ', 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা', 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'দ্বীপের রাজা' প্রভৃতি নাটক আজও অভিনীত হয়। প্রত্যেক যুগে সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন শিল্পরীতির জন্ম হয়। কিন্তু তিনি যেন সময়েরও আগে জন্মেছিলেন, সমাজ-রাজনীতি-দর্শন-নাটকের যে স্বর, যে সুর, যে ন্যারেটিভ, যে প্যাটার্নের তিনি জন্ম দিয়েছেন যত সময় যাচ্ছে তার আবেদন যেন বাড়ছে বই কমছে না। ভাষা অনেকটা জীবন্ত সত্তার মতো। প্রতিবাদী, বিদ্রোহী, বিপ্লবী জীবনের যেমন একটা সৌন্দর্য আছে। তেমনি ভাষার মাধ্যমে যখন অত্যাচার, শোষণ, অন্যায়, নিপীড়ন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিদ্রোহ, বিপ্লব উচ্চারিত হয়, তখন সেই ভাষারও আলাদা একটা সৌন্দর্যের জন্ম হয়। সাহিত্যিক-নাট্যকাররা বিশ্বের উন্নত চিন্তা-দর্শন-রাজনৈতিক সচেতনতা শিল্প জীবনের সাথে সাঙ্গীকৃত করে উন্নত ফর্ম বা রূপের মাধ্যমে প্রকাশের নিরন্তর চেষ্টায় থাকেন। চরিত্রে যে যত বেশি বৈচিত্র্য দেখাতে পারে, সামাজিক-রাজনৈতিক-মানসিক-আত্মগত দ্বন্দ্ব যত ভালো দেখাতে পারেন, ভাষা বা সংলাপে যত বেশি উইট, শ্লেষ, কৌতুক, স্যাটায়ার, হিউমার তথা রস বেশি ফোটাতে পারেন তার সৃষ্টি ততটা শিল্পসম্মত ও সার্থক হয়। ফর্ম আর কনটেন্টের একাত্মতার বিষয়টা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের নাটকে শোষণ, শৃঙ্খল এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যে ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি বিষয় আর রূপের একাত্মতার অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন।

ইয়ানান বক্তৃতায় সাহিত্য শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাও সে-তুঙ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন—

"Although man's social life is the only source of literature and art and is incomparably livelier and richer in content, the people are not satisfied with life alone and demand literature and art as well. Why? Be-

cause, while both are beautiful, life as reflected, more typical, nearer the ideal, and therefore more universal and art should create a variety of characters out of real life and help the masses to propel history forword."[১৭]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় সমসাময়িক-দৈনন্দিন-বাস্তব জীবনের উর্দ্ধে উচ্চ পরিকল্পিত, তীব্র, গভীর, একাগ্র ও প্রতীকী জীবনকে উপস্থাপিত করেছেন, যা আদর্শের কাছাকাছি এবং চিরন্তন একটা শৈল্পিকতা সৃষ্টি করেছে এবং সেই সঙ্গে তার সৃষ্টি সভ্যতার প্রগতিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বলেছেন—

"লেখক, যিনি সংবেদনশীল এক মানুষ, তিনি গল্পই লিখুন— কবিতাই লিখুন, রাজনীতি বাদ দিয়ে লিখবেন, এটা অসম্ভব। আমরা দেখতে পাই আমাদের দেশে কিছু কিছু লেখক আছেন যাঁরা রাজনীতিকে ছুতমার্গের মতো পরিহার করেন— এঁরা মিথ্যাচার করেন, প্রতারণা করেন। কারণ জীবনটাকে রাজনীতি ঘিরে রেখেছে অথচ তার মধ্যে যাব না, এটা একটা অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, অসম্ভব হাস্যকর জায়গা। কাজেই এই রকম রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে যদি আমাকে দিনযাপন করতে হয়, সেখানে আমার বক্তব্য থাকবে, প্রতিক্রিয়া থাকবে। আমাকে যেমন বলবে আমি তো শুনব না। আমার তো একটা কণ্ঠস্বর আছে, আমার তো একটা প্রতিক্রিয়ার মনোভাব রয়েছে, সেই নিয়ে আমাকে নাটক লিখতে হবে।"[১৮]

'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকে তিনি রাষ্ট্রশক্তি তথা শাসক শক্তির যে শাসন ও শোষণ কৌশল দেখিয়েছেন, তা আজকের দিনে বৈষম্য-শোষণমূলক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসক প্রভুদের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকে তিনি বাস্তব-পরাবাস্তবের মিশেলে ভাষা-চরিত্র-পরিবেশ সৃষ্টি করে সমাজের তথাকথিত সমাজপতিদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন— আমাদের আজকের সমাজ-রাষ্ট্রের দিকে তাকালেই সেই ছবিটা স্পষ্ট হয়। 'রাজরক্ত' নাটকে রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য করলে শাস্তি পাওয়ার কথা যে ভঙ্গিতে তিনি দেখিয়েছেন, যতদিন রাষ্ট্র থাকবে রাষ্ট্রের শাসন-শোষণ থাকবে এবং শাসিত-শোষিত জনগণ 'রাজরক্তের' জন্য বারবার বিদ্রোহী হবে। 'নিষাদ' নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, দ্বন্দ্ব, পিছুটান একই চরিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে রূপান্তরের মাধ্যমে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাও বাংলা নাটকে সম্পূর্ণ অভিনব। তিনি নিজে বামপন্থী ছিলেন এবং বিপ্লবী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনে, সংগ্রামে মাথা উঁচু করে বাঁচার লড়াই, অন্যদিকে সংসারের পিছুটান, মালিক শ্রেণির তোষামোদ করা— এই দুই বিপরীত অবস্থার দ্বন্দ্বকে নিখুঁতভাবে নাট্যরূপ দিতে পেরেছিলেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই রাষ্ট্রীয়-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে থাকা জীবনের দ্বন্দ্ব সংকটকে শৈল্পিক রূপ দিতে পেরেছিলেন। 'দ্বীপের রাজা' নাটকে পরমাণু-হাইড্রোজেন বোমার যে ভয়ঙ্কর রূপ তিনি দেখিয়েছেন, তা আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে জ্বলন্ত সমস্যা। 'বাঘবন্দী' নাটকে মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ যুবশক্তি যার স্বপ্ন আছে, আদর্শ আছে তাদের যেভাবে রাষ্ট্রশক্তি বন্দী করে রাখতে চায়, তাদের বন্দীত্ব অবস্থা থেকে লড়াইয়ের মাধ্যমে মুক্তির উপরেই

বর্তমান রাষ্ট্র-সমাজের মুক্তি নির্ভর করছে। 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা' নাটকে যে ফ্যান্টাসির জগৎ দেখানো হয়েছে, যে নতুন দেশের মানচিত্রের সন্ধানে যাত্রার কথা আছে তা সমস্ত পৃথিবীর রাষ্ট্রের শোষিত মানুষের কামনা, আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ ও উদ্দেশ্য। যেখানে মাটি খুঁড়লে সোনা আর হাত বাড়ালে বাতাস পাওয়া যাবে। চরিত্রের এত বিচিত্রতা, অসামান্য উইট, কৌতুক এবং শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের যাত্রা— বাংলা তথা বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে এইরকম আর দুটি নাটক নেই। সামাজিক-রাজনৈতিক- রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা এবং অসামান্য নাট্য প্রতিভা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছালে এইরকম একটা নাটকের জন্ম হয়। মাও-সে-তুঙ বলেছেন—

> "Literature and art are subordinate to politics, but in their turn exert a great influence on politics. Revolutionary literature and art are part of the whole revolutionary cause, they are cogs and wheels on it."[১৯]

জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি গৌতমবুদ্ধ, চৈতন্যদেব ও মীরজাফরকে নিয়ে নাটক লিখতে চেয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে প্রচুর পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত তিনি গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে 'তথাগত' নাটক লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-কালমার্কস ছাড়াও গৌতম বুদ্ধকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও পথপ্রদর্শক হিসাবে মানতেন।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি আবার প্রথম জীবনের মতো কাব্যমেশানো উদ্ভট নাটক লিখতে চান কিনা? নাট্যকার উত্তরে বলেছিলেন, ''খুবই মনে হয় ওই ধরনের নাটক লেখার কথা। কেউ কেউ যে অভিনয় করতে চায় না এমনটাও নয়, কিন্তু আমিই ঠিক ভরসা পাই না। আসলে কী জানো, বয়স হয়েছে তো, নিজেকে আমার খানিকটা অভিভাবকের মতো মনে হয়। একটা নাটক নামাতে কত পরিশ্রম, কত খরচ কিন্তু কেউ তো দেখবে না ওই রকম নাটক, পুরো খরচাটাই জলে যাবে সে দলের, তাই শেষ পর্যন্ত আর লেখা হয় না।''[২০]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রকৃত অর্থেই ছিলেন বাংলা থিয়েটারের অভিভাবক। তাঁর উদার স্নেহস্পর্শে কত থিয়েটার কর্মী যে উপকৃত হয়েছিলেন তা গুণে শেষ করা যাবে না। নবীন নাট্যকর্মীদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম স্নেহ, ভালোবাসা। পরম মমতায় ও যত্নে তিনি তাঁদের নাটক পরিমার্জনা করে দিতেন। নাটকের ত্রুটি বিচ্যুতি শুধরে, পরিমার্জিত নতুন রূপে উপস্থাপিত করার কাজটা তিনি খুব সুন্দরভাবে করতেন এবং নবীন নাট্যকারদের অসংখ্য নাটক তিনি পরিমার্জনা করে দিয়েছিলেন। সৌমিত্র বসু তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'অনন্ত সময় হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগে যে কোনো নাটক শুনতেন তিনি, ভারি চমৎকার সব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারতেন যে কোনো লেখাকে, গোলমালের জায়গাগুলো কীভাবে মেরামত করা যায়, তার হদিশ দিতেও মোহিতদার জুড়ি ছিল না। সত্যি বলতে কী; আমাদের পরিকল্পনাই ছিল, নাটক মেরামতি কেন্দ্র বলে একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেব মোহিতদার বাড়ির দরজায়।'[২১]

নাট্যব্যক্তিত্ব শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার তাঁকে বলেছিলেন তিনি যদি ছোট নাট্যকারদের পিছনে সময় না দিয়ে সেই সময়টা নিজের নাটক লেখার কাজে ব্যয় করতেন, তবে তিনি আরও বড় নাট্যকার

হতেন, কিন্তু উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি আরও বড় নাট্যকার না হয়ে যদি তার সাহায্যে বা পরামর্শে আরও নতুন কিছু নাট্যকার তৈরি হয়, তবে তাতেই তার আনন্দ। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে খাঁটি মানুষকে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির সেই মানুষগুলোকে সন্ধান করেছেন, যে মানুষগুলো নানা দুরবস্থার মধ্যে নড়বড়ে হয়ে পড়ে, কিন্তু তাদের মধ্যে যে খাঁটিত্ব আছে, যে নৈতিক শক্তি আছে— তাকে জাগাতে চেয়েছেন তিনি। মানুষ যদি খাঁটি না হয়, তবে রাজনীতি খাঁটি হবে না, আর রাজনীতি তো দেশের বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ভালো মানুষের উপরেই ভালো রাজনীতি নির্ভর করছে। তিনি সবসময় সুস্থ রাজনীতির পক্ষে ছিলেন। মানুষ এবং একই সঙ্গে দেশগড়ার কথা বলতেন। তিনি বলেছেন—

> ‘‘কেবলমাত্র রাজনীতি নয়, পাশাপাশি মানুষের গঠন ও গড়ন খাঁটি মানুষের জায়গাটা কোথায় ভূমিকাটা কী? এটা যদি প্যারালাল না রান করানো যায়, তবে রাজনীতি বারবার ব্যভিচারের মধ্যে পড়ে যাবে। মানুষ সঠিক জায়গায় যাচ্ছে না। রাজনীতির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে বলেই মানুষকে আমি শ্রদ্ধেয় করে তুলতে চাই।’’[২২]

মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে তিনি একজন লেখক হিসেবে ভুলে থাকতে পারেন না। আমাদের সমাজ-পরিবেশকে তিনি কখনো ভুলে থাকেননি। সেই পরিবেশ যেখানে নানা অভাব-অভিযোগ, অসুখ-অসন্তোষ, স্বপ্নহীন, আশাহীন মানুষ কোনক্রমে বেঁচে আছে। যেখানে কোনরকম জাগরণের বাণী নেই, আন্দোলনের সচলতা নেই, জীবনের সজীবতা নেই। এইরকম মরোন্মুখ, ধ্বংসন্মুখ সমাজকে একমাত্র বাঁচানো যেতে পারে সঠিক রাজনীতির সোনার কাঠির ছোঁয়ায়। তাই তিনি লেখক-শিল্পীদের বারবার সমাজ-রাজনীতি সচেতনতার কথা বলতেন। সেই রাজনীতির কথা বলেছেন যা মৃতপ্রায় সমাজকে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দেয়— নতুন করে নির্মাণের শক্তি জোগায়। সেই রাজনীতি যা জীর্ণপুরাতন সমাজ-পরিবেশকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যা সমাজে সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে দিতে পারে। তাই একজন লেখককে তিনি মানুষ ও সমাজের ‘বিবেকের ভূমিকা’য় দেখার কথা বলেছেন। যে লেখায় মানুষের কথা নেই, মানুষের উন্নতি, প্রগতির কথা নেই, সেই লেখাকে তিনি মনে করেন ‘বিবেকহীন বিভ্রান্তি’। নিজের বিবেক ও কর্তব্যের দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ‘মানুষের হয়ে, মানুষের জন্যে’ লিখেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. মোহিত চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। কলকাতা। ২০০৬, পৃ. ১৪

২. মোহিত চট্টোপাধ্যায়য়ের নাট্য সংকলন। সমীক্ষণ। কলকাতা।১৯৯০। ১৮৬

৩. মোহিত চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। পৃ. ১৪-১৫।

৪. প্রমা-মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা-২০১৩। সম্পাদক-শুভঙ্কর রায় কলকাতা। পৃ. ১৫০

৫. অনুষ্টুপ। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক। ৩৮ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৪১১। সম্পাদক অনিল

আচার্য। পৃ. ১৯৪। কলকাতা।
৬. রঙ্গপট নাট্যপত্র ২০১২। মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা সম্পাদক ড: তপনজ্যোতি দাস। কলকাতা। পৃ. ২৭
৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩২১।
৮. অনুষ্টপ। ১৪১১। পৃ. ১৯৬।
৯. মোহিত চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত নাটক সংগ্রহ। ২০১০। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। ভূমিকা। কলকাতা।
১০. মোহিত চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। পৃ. ২১।
১১. রঙ্গপট নাট্যপত্র। ২০১২। পৃ. ২১৯।
১২. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৩০।
১৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৩০।
১৪. প্রাগুক্ত। পৃ. ২২৫।
১৫. অনুষ্টুপ। ১৪১১। পৃ. ১৭৪।
১৬. MaoTse-tung/Literature and Art Rahul Foundation/Lucknow/2017/INDIA/ Page-34.
১৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৪।
১৮. রঙ্গপট। নাট্যপত্র ২০১২। পৃ. ৩৭২।
১৯. MaoTse-tung/Literature and Art Rahul Foundation Lucknow/2017/INDIA/ Page-34.
২০. অনুষ্টুপ, ১৪১১। পৃ. ১৯৭
২১. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৯২
২২. অনুষ্টুপ ১৪১১। পৃ. ১৪৭।